# নদীর সঙ্গে সখ্যতাতেই ভুমির প্র াচুর্য

কল্যান দ্র



প্রায় সাত কোটি বছর ধরে পলি সঞ্চিত হয়ে গঠিত হয়েছে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ। পৃথিবীর এই বৃহত্তম বদ্বীপের ভূ-গঠন প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী প্রতিবছর প্রায় ১৬৭ কোটি টন পলি বহন করে আনে। খনিজ তেলের সন্ধানে খনন করার সময় জানা গেছে বদ্বীপের নরম পলিস্তরের নীচে রয়েছে একটি কঠিন শিলাস্তর। এই শিলাস্তরের ওপরে সঞ্চিত পলিস্তরের গভীরতা পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ক্রমশ বেড়েছে এবং বদ্বীপের পূর্ব প্রান্তে এই গভীরতা প্রায় ১২০০০ মিটার। বদ্বীপ গঠনের প্রথম পর্যায়ে বঙ্গোপসাগর উত্তরে প্রায় রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই সময় ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে নেমে আসা বাঁশলই, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর ও রূপনারায়ণ ও হলদি নদী রাঢ় সমভূমি গঠনের কাজ শু করেছিল। ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বর্তমান রাঢ় সমভূমি হল ঐ সব নদীর তৈরি ছোট ছোট বদ্বীপের সম্মিলিত রূপ। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে গড়ে ওঠা এই সমভূমির মাটির রঙ লালচে - ছোটনাগপুর মালভূমির শিলাস্তরে মিশে থাকা লৌহ কণিকা ক্ষয় হয়ে রাঢ় সমভূমির মাটিতে মিশেছে বলেই এখানকার মাটির রঙ লাল। উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্র ভূমি, পূর্ববঙ্গের মধুপুর গড় ও লালমাই এলাকার মাটির রঙও ল ালচে। এইসব এলাকার উচ্চতাও আশেপাশের পলিগঠিত এলাকার তুলনায় প্রায় ২০ মিটার বেশিই। রাঢ় বারেন্দ্রভূমি-মধুপুরগড় ও লালমাই এলাকা বদ্বীপের ম ানচিত্রে ঘোড়ার খুরের মতো বা ধনুকের আকারে বিন্যস্ত। এই বিন্যাসকে ভূতাত্ত্বিকরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মেজর এফ সি হার্স্টের মতে এই এলাকাগুলি হল উত্থিত অঞ্চল (areas of irregular upheavel) । অধ্যাপক সত্যেশ চক্রবর্তীর মতে মাইয়োসিন যুগে ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর বহমান এক সমুদ্রস্রোতের বয়ে আনা পলি জমে তৈরি হয়েছে এই লালমাটির এলাকা। সেই সময় এই এলাকা ছুঁয়েই ছিল উপকূল। আর সমুদ্রস্রোতের বয়ে আনা পলি জমে তৈরি হয়েছিল এক ধনুকের আকারের পুরোদেশিয় বাঁধ (offshore bar) । পরে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে এই বাধঁটি ভাগে খন্ডিত হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালে মর্গান ও ম্যাকিনট্যায়ার নামে দুই ভূতাত্ত্বিক ও ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মতে, বাংলাদেশের যমুনা বা ব্রহ্মপুত্র নদীর খাত বরাবর ভূমিভাগ ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে। এই অবমননের প্রতিক্রিয়ায় নদীর দুপাশে বারেন্দ্রভূমি ও মধুপুরগড় এলাকা উঁচু হয়ে উঠছে। বদ্বীপ পূর্বমুখী হেলে পড়ার ফলেই গত দুই শত াব্দীতে এ অঞ্চলের অনেক নদীর গতিপথ আমূল বদলে গেছে। গঙ্গার মূলস্রোত পদ্মার খাত ধরে বইতে শু করেছে, ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা-চূর্ণী, জলঙ্গী ইত্যাদি শাখ ানদীগুলি মজে গেছে। উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদী গতিপথ বদলে যমুনায় মিশেছে আর তিস্তার শাখা করতোয়া, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা শুকিয়ে গেছে।

বদ্বীপের পলি সঞ্চয়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায়, পৃথিবীর উত্তাপ বাড়া কমার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য উপকূল এলাকার মতো এখানেও বঙ্গোপসাগরের জল কখনও উত্তর দিকে এগিয়ে এসেছে আবার পরে দক্ষিণে সরে গিয়েছে। প্রায় ছয় হাজার বছর আগে গাঙ্গেয় বদ্বীপের উপকূল এক স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছ ায়। সেইসময় থেকে উপকূল এলাকার ভৌগলিক রূপ বদলেছে ধীরে ধীরে। বদ্বীপের মানচিত্র লক্ষ করলে বোঝা যায়, পশ্চিমে ভাগীরথীর মোহানা বরাবর ভূমিভ াগ দক্ষিণে যতখানি বিস্তৃত, পূর্বে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার মোহনায় ততখানি নয়। অর্থাৎ, পশ্চিমে ভূ-গঠনের কাজ যতটা পরিণত হয়েছে পূর্বে ততখানি হয়নি। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, যে শিলাস্তরের উপর পলি সঞ্চিত হয়ে বদ্বীপ গঠিত হচ্ছে, সেটি পূর্ব দিকে ক্রমশ হেলে পড়েছে। ফলে, ভাগীরথীর মোহানা বরাবর ভূমিগঠনে যত পরিমাণ পলি সঞ্চিত হয়েছে, তার তুলনায় পদ্মা-মেঘনার মোহনায় অনেক বেশি পলি সঞ্চিত হয়েছে। তবু পূর্ব প্রান্তে ভূমিগঠনের কাজ পশ্চিম প্রান্তের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে, অথচ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার মূলস্রোত প্রচুর পলি বহল করে বদ্বীপের পূর্ব প্রান্ত ধরেই সাগরে মেশে।

অতীতে কি সুন্দর বনে বসতি ছিল

গত দু'হাজার বছরে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রে বদ্বীপের উপকূলে ভূমিগঠনের কাজ এগিয়েছে খুব ধীর গতিতে। ১৫০ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক ভূগোলবিদ টলেমি গাঙ্গেয় বদ্বীপের উপকূলের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার সাথে বর্তমান অবস্থার খুব বেশি পার্থক্য নেই। গঙ্গা সেইসময় পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে সাগরে মিশত। তাম্রলিপ্ত ছাড়াও সেই সময় উপকূলে তিলগ্রামন ও পলেরা নামে দুটি শহরের কথা টলেমির বর্ণনা থেকে জানা যায়। ঐতিহাসিকরা এই শহর দুটিকে খুঁজে না পেলেও, সুন্দরবন জুড়ে বহু পুরাতাত্ত্বিক ধবংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এইসব পুরাতাত্ত্বিক উপাদান ও বিদেশি পরিব্রাজকদের নানা বর্ণনা থেকে একথা প্রমাণিত যে, খ্রিস্টপূবত ৩০০ অব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গাঙ্গেয় বদ্বীপের মোহানা অঞ্চল জুড়ে গড়ে উছেছিল এক উন্নত সভ্যতা। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিকরা যখন এদেশে বাণিজ্য করতে আসে, তখন সুন্দরবনে কোনও বসতি নেই, বিস্তীর্ণ এলাকা ঘন জঙ্গলে পূণত। অধিকাংশ এলাকাই জোয়ারের জলে ডুবে যায় আবার ভাঁট ায় জেগে ওঠে। এমন এলাকা মানুষের বসবাসের অযোগ্য। অছত এই এলাকাতে একদা মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কীভাবে সেই জনবসতি ধবংস হল? অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সুন্দরবনে আবাদ তৈরির কাজ শু হয় নতুন করে। সেই সময় পাওয়া যায় বহু পুরাতাত্ত্বিক ধবংসাবশেষ। এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে ঐতিহাসিকদের ধারণা হয়, ১২০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য সুন্দরবন এলাকা মানুষের বসবাসেরঅযোগ্য হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব।

উপর তলে ভূমিভাগের ক্ষয়

গত দুই শতাব্দীতে গাঙ্গেয় বদ্বীপের যেসব মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি তুলনা করলে দেখা যা, এই সময়ের মধ্যে উফকূলে কোনও নতুন ভূমি গঠিত হয়নি। বরং সাগর এগিয়ে আসছে ক্রমাগত। বিপুল পরিমাণ পলি প্রতি বছর মোহানায় সঞ্চিত হচ্ছে কিন্তু কোনও ভূমি তৈরি হচ্ছে না —এই আপাত বিপরীত প্রক্রিয়াকে ন ানভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সাম্প্রতিক উপগ্রহ চিত্র দেখলে বোঝা যায়, মোহনায় জলের নীচে পলি প্রায় ৪০-৫০কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত সঞ্চিত হলেও উপরের ভূমিভাগ ক্ষয় হচ্ছে ক্রমাগত। ভূতাত্ত্বিকরএই ঘটনাকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ----

১। পূর্ব-পশিমে প্রায় ২০০ কিলোমিটার বিস্তৃত উপকূলের মাঝামাঝি গড়াই নদীর মোহানার থেকে সাগরের গভীরতর অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি খাত রয়েছে যার নাম সোয়াচ্ অব নো গ্রাউন্ড (Swatch of no-ground)। এই খাত ধরে প্রচুর পরিমাণ পলি সাগরের গভীরে চলে যায় বলেই উপকূলে নতুন ভূমি গঠিত হয় না।

২। পৃথিবীর উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে, ফলে মে ও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের হিমবাহ ক্রমশ গলে যাচ্ছে। এই বরফ গলা জল নদীখাত ধরে প্রবাহিত হয়ে ক্রমাগত সাগরে মিশছে এবং সমুদ্রের জলতল ক্রমশ উঁচু হয়ে উপকূলের ভূমিভাগকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে, বঙ্গোপসাগরের জল যদি এক মিটার উঁচু হয়ে ওঠে তবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা আর মেদনীপুরের উপকূলে প্রায় এক হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হবে। ঝিজোড়া সমীক্ষায় প্রকাশ, সমুদ্রের জল-স্তর প্রতিবছর মাত্র দ ০.২০-০.৩০ মিলিমিটার হারে উঁচু হচ্ছে তাই বরফগলা জলের প্রভাবে উপকূলে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটছে না। মতান্তরে সাগরের জল উত্তাপে ফুলে উঠছে বলেই উপকূলে অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকা প্লাবিত হচ্ছে।

৩। অনেকের মতে উপকূল এলাকার সঞ্চিত পলি ক্রমশ জমাট বেঁধে বসে যাচ্ছে। ওপরের পরি আর জলের চাপ এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করছে। এই ভূমি অবনমনের কাজ চলেছে ধীরে ও ক্রমাগত। কলকাতা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে বাংলাদেশের গোয়ালন্দ (পদ্মা-যমুনার সংযোগস্থল) পর্যন্ত একটি সরলরেখা টানলে বদ্বীপ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। ভূতাত্ত্বিকরা উত্তর-পশ্চিমের অংশটিকে স্থিতিশীল (Stable shelf zone) এবং দক্ষিণ-পূর্বের অংশটিকে অবনমিত ছব্দত্তব্ধনস্তন্ন্ধ পুনব্ধব্ধপ্সজ্জ্রপ্ত ব্ধজ্জ্রন্তব্ধগ্ন অঞ্চল বলে চিহিত করেছেন। সুন্দরবন এই অবনমিত অংশ অবস্থিত। সুন্দরবনের প্রাচীন সভ্যতা ১২০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সম্ভবত এই ভূমি অবনমনের কারণেই ধবংস হয়েছিল। রেনেল সাহেব অবশ্য লিখেছেন ---- বাখরগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন এলাকা মগ জলদস্যুদের অত্যাচারে জনবিহীন হয়েছিল। কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থানে কূপ খননের সময় মাটির প্রায় তিন মিটার গভীরে একটি পিটস্তর পাওয়া গিয়েছিল। ক্যানিং ও পাওয়া গিয়েছিল সোজা দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরী গাছ। এসব দেখলে মনে হয়, হঠাৎ ভূমিকম্প বিস্তীর্ণ এলাকা বসে গিয়েছিল। বর্তমান সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা সাগরের গড় জলস্তর থেকে মাত্র তিন মিটার উপরে অবস্থিত আর ভরা কোটালে জল ফুলে ওঠে প্রায় পাঁচ মিটার। এমন অবস্থার মধ্যেও নদীর দুই পাড়ে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে জনবসতি। এমন অপরিণত এলাকায় বসতি স্থাপন করলে ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের মতো দুর্যোগে বহু মানুষ বিপন্ন হবে ---- এটাই স্বাভাবিক।

৪। মানুষের নানা কার্যকলাপ ভূগঠন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার নদীগুলি যত পরিমাণ পলি বহন করে তার অনেকখানি নির্মিত বাঁধ ও জলাধারে জমে যাচ্ছে। এই কারণেও উপকূলে ভূগঠন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

৫। গত কয়েকে শতাব্দীতে সুন্দরবনের জনবসতি বিকাশের সাথে বনাঞ্চল সংকুচিত হয়েছে। প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রঝড় ও ঝড় এখন সহজেই উপকূলে আঘাত করে ও ক্ষয় করে।

নদী নিয়ন্ত্রণ বন্ধ হোক

গাঙ্গেয় অববাহিকার ব্যাপ্তি প্রায় ১০.৫০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। অববাহিকায় অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকা প্রবহমান জলস্রোত ও অন্যান্য শক্তির প্রভাবে ক্রমাগত ক্ষয় হয় এবং নদী এই পলি বহন করে মোহানায় সঞ্চয় করে। এই প্রক্রিয়া চলছে অনন্তকাল ধরে, ধীরগতিতে। একজন মানুষের জীবদ্দশায় এই পরিবর্তন বোঝা যায় না।

নদীর স্রোত মোহানার কাছে দ্বিমুখী। বদ্বীপের নীচের দিকে নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলা করে। গঙ্গা সাগর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত হুগলী নদী ধরে জোয়ারের জল যায়। জোয়ার শু হওয়ার চার ঘণ্টার মধ্যে নদীর জল সর্বাধিক উচ্চতায় উঠে পরবর্তী আট ঘণ্টা ধরে নামতে থাকে। জোয়ারের স্রোত যে গতিতে ঢোকে, ভাঁটার স্রোত তার তুলনায় ধীরে ফেরে। উত্তরমুখী জোয়ার মোহানা থেকে প্রচুর পলি নিয়ে আসে, ভাঁটা দুর্বল স্রোত এক পলি ফিরিয়ে নিতে পারে না। এই জন্য নদীর যে অংশে জোয়ার-ভাঁটা খেলা করে, সেখানে পলি সঞ্চয়ের ক্ষমতা অনেক বেশী। সাগরের স্রোত এইভাবে বদ্বীপের ভূমি গঠনে সাহায্য করে। তাই বদ্বীপের যে অংশ পর্যন্ত জোয়ার-ভাঁটা খেলা করে, সেই অংশের জল সুপেয়, মাটিও উর্বর। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীর দুই বা এক পাড়ে মাটির বাঁধ তৈরি করলে প্লাবনভূমি পলি সঞ্চয় প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ, জলাধার বা ব্যারেজ তৈরি করলেও প্রবহমান পলি আটকে যায়। মানুষের এই সব কার্যকলাপ নদী অববাহিকার গতিশীল ভারসাম্যকে নষ্ট করে, তখন নদী অস্থির হয়ে ওঠে। বাড়তে থাকে ভাঙন ও বন্যার প্রবণতা।

'নদীর একূল ভাঙে ওকূল ভাঙে' --- শৈশবে শেখা এই আপ্তবাক্যটি প্রাক্-প্রৌঢ়ত্বে ঘুরে ফিরে আসে। নদীপাড়ের মানুষরা তো সজজীবন দিয়ে বুঝেছেন একথার অর্থ। নদী কি তবে প্রতিশোধ নেয়? আমরা চেয়েছিলাম নদীকে বশে আনতে। কিন্তু নদী আমাদের বশ্যতা মানবে কেন? এখন নদীর আক্রোশের শিকার বহু মানুষ ----

কূলত্যাগিনী নদী হ্রাস গ্রাস করছে গ্রামের পর গ্রাম। অথচ এই নদীই তো আমাদের দিয়েছিল সমৃদ্ধি --- সুজলা সুফলা কৃষিজমি। তবে কি আমরা বুঝতে পারিনি নদীকে। তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ডেকে এনেছি বিপদ।

নদীর চলার পথ প্রকৃতির নিয়মেই আঁকাবাঁকা। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে জানা গেছে, নদীর প্রবহমান জলস্রোত স্প্রিং -এর মতো তত্রাকারে আবর্তিত হয়। ফলে নদীর এক পাড় ভাঙে অন্য পাড়ে পলি সঞ্চয় হয়। উৎস থেকে মোহানার দিকে নদীর একসময় আর সবপলি বহন করতে পারে না। বয়ে আনা পলি নদীখাতে সঞ্চিত হলে জলপ্রবাহের পথ দ্ধ হয়। এইভাবেই নদীর গতিপথ আঁকাবাঁকা হয়ে যায়। নদী একটি নির্দিষ্ট ব্যাপ্তিতে পেণ্ডুলামের মতো গতিপথ বদলায়। নদী বিজ্ঞানের ভাষায় এই এলাকাটিকে বলে 'মিয়েণ্ডার বেল্ট', বাংলায় 'প্লাবনভূমি'। পলি সঞ্চিত হয়ে প্লাবনভূমি গঠনের কাজ একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছলে, নদী গতিপথ বদলায়। পরিবর্তিত পথে নদী আবার নতুন করে ভূমি গঠনের কাজ শু করে। এ প্রসঙ্গে একটি গুত্বপূর্ণ বিষয় হল নদীর বাঁকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং ব্যাসার্ধ প্রবহমান জলের আনুপাতিক। জল বাড়লে নদীর বাঁক বড় হয়, জল কমলে আবার ছোট হয়ে যায়।

জল আর পলির এই গতিশীল ভারসাম্য এখন মানুষের নানা কাজে বিঘ্নিত হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে বদ্বীপের ভূমিগঠনের প্রাকৃতিক নিয়ম। অববাহিকার বনাঞ্চলের সংকোচন, কৃষিব্যবস্থার প্রসার, ভৌম জলস্তরের যথেচ্ছ শোষণ ও বাঁধ নির্মাণ এসব কিছু নদীর ভারসাম্যকে নষ্ট করছে। নদীও অস্থির হয়ে এসব বন্ধন থেকে মুক্তি চাইছে। নদীকে যতদূর সম্ভব অনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রবাহিত হতে দেওয়াই ভালো --- গত পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এই সত্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। নদীকে নিয়ন্ত্রণ নয় ---- নদীর সাথে সহাবস্থানের চেষ্টাই আমাদের অস্তিত্বের ও বৃহত্তর মঙ্গলের শর্ত।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com